Prajñābāridhi : Journal of Multidisciplinary Research
Journal Homepage - https://www.collegetsm.in/college-journal/

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বর্ধমানের ভূমিকা

হরমোহন বন্দোপাধ্যায়
সদস্য, পরিচালন সমিতি, তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলায় নবজাগরণের যুগ বলে কথিত।

এই শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষকার প্রভাবে এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে যেমন সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মচিন্তার পভূত উন্নতি হয়েছে, তেমনি উদার মতবাদ, সমাজ সংস্কার মনস্কতা, রাজনৈতিক চেতনা বাঙালীর ভৌমজীবন ও ভাবজীবন মর্ত্যজীবন ও অধিমানসের জীবন দুই প্রান্তেই নবপ্রত্যয় ও আবেগের উল্লাস সঞ্চারিত হয়েছিল। ফলে এই যুগকে অনেকেই পাশ্চাত্যের অনুকরনে রেনেসাঁস বা নবজাগরনের যুগ বলতে চান। নবজাগরনের প্রভাবে নবজীবনের বাণীতে বাংলা ও বাঙালীর যে সর্বাত্মক বিকাশ ঘটেছিল রাঢ়ের বর্ধমান তার শরিক হয়ে বিশেষ অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। তাই বর্ধমান জেলাকে রাঢ় বঙ্গের কেন্দ্রীয় ভূমি বা মধ্যমনি বলা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে নবজাগরণের স্রষ্টা ছিলেন দুজন - একজন রাজা রামমোহন রায় ও অপরজন জন্মসূত্রে পরতু গীস হলেও মনেপ্রাণে ভারতীয়। তিনি হলেন- হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

রামমমোহনের কৃতিত্ব অস্বীকার না করেও বলা যায়- হিন্দি কলেজের শিক্ষকরূপে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী শিক্ষা এবং সম্মোহনী বক্তৃতায় ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে নূতন ধ্যানধারনা ও প্রানচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলে তৎকালীন বাংলাদেশে এক অসাধারণ জনজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

ডিরোজিওর ছাত্র ও অনুগামীরা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যে নূতন চেতনা সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তারই ফলে ধর্মের আন্দোলনে, সমাজসংস্কারে, সাহিত্যে, দার্শনিক চিন্তায় নবযুগের সূচনা হয়েছিল। ডিরোজিওর এ্যাকাডেমিক এ্যসোসিয়েশন ও রামমোহনের আত্মীয়সভা (১৮১৫ পরবর্তী কালের ব্রাহ্মসমাজ) বাংলার নবজাগরনের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এই নবজাগরণের উদ্দীপনায় বর্ধমান ও বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

নবজাগরণের যুগে বর্ধমানের যে দুই প্রধান পুরুষের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও অক্ষয় কুমার দত্ত। এঁরা দুজনেই বর্ধমান জেলার সন্তান। শহর বর্ধমানের উত্তর পূর্বে সোনাপলাশী গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ ই ডিসেম্বর লালবিহারী দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী ডাফ কর্তৃক লালবিহারী খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ইনিই হলেন বাঙাখ্রীষ্টান, ইনি সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং হুগলী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। ইনি "Recollection of Alexandero Duff "নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক রো সাহেব বাঙালী খ্রীষ্টানের এই ইংরাজী লেখাকে Babu Rnglish বলে ব্যঙ্গ করেন। তেজস্বী এই বাঙালী খ্রীষ্টান তীব্রভাষায় ইংরাজীতেই অধ্যাপক রো সাহেবের রচনার ভুরি ভুরি ইংরাজী ভুল ধরিয়ে দিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেন্ড লালবিহারী গ্রাম বাংলার গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত খেটেখাওয়া কৃষিজীবীদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন অবলম্বনে একখানি উপন্যাস ইংরাজীতে লেখেন। উপন্যাসটির নাম 'Govinda Samanta' পরে উপন্যাসটির নাম দেন "Bengal Peasant Life" ঊনবিংশ শতকের নিম্নবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে সুখ দুঃখ আনন্দের কাহিনী উপন্যাসটির উপজীব্য। এছাড়াও এতে জমিদারী ও প্রজাসত্ত্বের কথা আছে। রূপকথা বিষয়ক আরও একটি উপন্যাস লেখেন- Folk Tales of Bengal" নামে । এটি লিখতে ইংরেজরা অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন দিয়েছিলেন।

তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করলেও তিনি অন্তরে ছিলেন খাঁটি বাঙালী । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সময় তিনি রেভারেন্ড হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ইংরাজী সাহিতা চর্চার জনন্য তিনি ''ফেলো'' নির্বাচিত হন। তিনি আজীবন ছিলেন শিক্ষাব্রতী। বহু প্রবন্ধ লিখে ঊনবিঘশশতাব্দীর শিক্ষা জগতে তিনি বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীরবাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দনাথ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ততত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করলে অক্ষয়কুমার উক্ত পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত ''সংবাদ প্রভাকর'' পত্রিকার জন্য বিভিন্ন ইংরাজী পত্রিকার প্রবন্ধাবলীর বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করতেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর দক্ষ সম্পাদনায় সাহিত্য, দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা, হতিহাস, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নত মানের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, হিন্দুবিসমর্থনে বাল্যবিবাহ ও বিবিধ কুসংস্কারের, নীলকর সাহেব ও জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে নির্ভিকভাবে যুক্তিবহুল বলিষ্ঠ লেকা প্রকাশের ফলে পত্রিকাটি অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পত্রিকার মর্যাদা পায়। তবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।'' ভারতবর্ষীয় উপসাসক সম্প্রদায়'' রচনাটি।

তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে বিজ্ঞান সম্মত করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং নিজে অনেকগুলি ইতিহাস বা বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষনাধর্মী রচনার দ্বারা বাংলাগদ্যের প্রথম পবেড়র অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনিই বাংলাগদ্যে মননশীল গবেষণাধর্মী রচনার উপযোগী দৃঢ় সংযত রূপ দান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক স্থাপিত কলকাতায় নর্মাল স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন।

ডিরোজিওর অনুগামী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অন্যতম প্রবক্তা রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রামতনু লাহিড়ী। এঁরা দুজনেই ছিলেন গোঁড়া সংস্কার মুক্ত ও [আশ্চাত্য আদর্শে বিশ্বাসী। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ মল্লিক বর্ধমানে তিনি অনেকদিন বাস করেছিলেন।তাঁর নির্ভিকতা সর্বজনবিদিত। সেই সময় সুপ্রীমকোর্টে সাক্ষ দেবার সময় তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল হাতে নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করতে হত। কোনো নিকটি মোকদ্দমায় সাক্ষী যুবক রসিককৃষ্ণ মল্লিককে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল হাতে নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করতে বললে, রসিক গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন-''I do not belive in the sacredness of the ganges'' এই উত্তরে সেদিন সমগ্র আদালত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় বর্ধমানে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সাহায্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ স্কুলের তখন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন মি. জে. ওয়ার্ড। এই স্কুলটি তাই '' ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন'' নামে খ্যাত হয়। ওয়ার্ড সাহেব মহারাজার ভার্নাকতিনি পরে এই স্কুল ছেড়ে সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ওয়ার্ডের পর ওয়াটসন প্রধান শিক্ষক হন। এরপর তৃতীয় প্রধান শিক্ষক হিসাবে ঐ স্কুলে স্বনামধন্য রামতনু লাহিড়ী মহাশয় নিযুক্ত হন। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে রামতনু লাহিড়ী বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন। বর্ধমানে থাকাকালীন রামকৃষ্ণ ও রামতনু দুই বন্ধুতে একত্রে বাস করতেন।

রসিককৃষ্ণের মতই রামতনু ছিলেন গোঁড়া সংস্কারমুক্ত ও পাশ্চাত্য আদর্শে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মণের ছেলে রামতনু উপবীত ত্যাগ করায় বর্ধমানবাসী তাঁকে বিধর্মী বলে সামাজিক বয়কট করেন। বেগতিক দেখে রামতনু কলকাতায় চলে যান। বর্ধমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে রসিককৃষ্ণ ও রামতনুর সহযোগিতা মিশনারীদের স্বপ্নকে সফল করতে সাহায্য করেছিলেন।

নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ, স্বদেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। বর্ধমানের সঙ্গে চক্ষিণারঞ্জনের এক বিশেষ ঘটনার সংযোগ স্থাপিত হয়। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র, জ্যেষ্ঠা মহিষী নানকীদেবী, তাঁর পুত্র প্রতাপচাঁদ, অন্যতমা মহিষী কমলকুমারী জীবিত থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে কমলকুমারীর ভ্রাতা এবং বর্ধমানের দেওয়ান পরানচাঁদ কাপুরের বালিকা কণ্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহারাণী বসন্তকুমারী বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে একপ্রকার বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। কোন এক বসন্তপঞ্চমীর মহোৎসবে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে বসন্তকুমারীর যোগাযোগ ঘটে। তখন বসন্তকুমারী দক্ষিণারঞ্জনের সাহায্যে বিষয় সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য গোপনে পরামর্শ করে দুজন দাসী ও একজন পুরুষ আত্মীয়সহ দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে বর্ধমান ত্যাগ করেন।
বসন্তকুমারীর প্রতি দক্ষিণারঞ্জনের সহানুভূতি ও সমবেদনা এবং দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি বসন্তকুমারীর বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা ক্রমে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেমে পরিণত হয়। দক্ষিণারঞ্জন মনে করতেন যে, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্পর্ণ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা তাই তিনি বিধবা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। পরে তৎকালীন কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্চের সম্মুখে সাক্ষী রেখে তিনি সিভিল ম্যারেজ নামক বিবাহ করে অসবর্ণ বিধবা বিবাহ আইন পাশ হোয়ার আগেই দক্ষিণারঞ্জন একই সঙ্গে অসবর্ণ এবং বিধবা বিবাহ করে সেযুগে আলোড়ন তুলে দিয়েছিলেন।

এরপর নবজাগরণের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ হিসাবে রাজা রামমোহন রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জন্মস্থান বর্তমানে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে হলেও সেসময় রাধানগর গ্রামটি ছিল বর্ধমানের অন্তর্গত ভুরশুট পরগনার অধীনে। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন বর্ধমানের মহারানী বিষ্ণুকুমারীর গুরু ও মোক্তার। সুতরাং রামমোহন রায়কে বর্ধমানের সন্তান বললে ভুল হবে না। সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য তিনি কয়েকবার ই বর্ধমানে এসেছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের প্রকৃত রূপকার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী রাজনারায়ন বসুকে সঙ্গে নিয়ে দামোদরের উপর দিয়ে নৌকাযোগে বর্ধমানে এসেছিলেন। বর্ধমানরাজ

মহাতাব চাঁদ স্বয়ং মহর্ষিকে আপ্রায়ন করেন এবং রাজবাড়ীতে নিয়ে এসে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে মহাতাব চাঁদ দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ ই জুলাই বর্ধমান রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ সালে সাধারণ নাগরিকদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বর্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাহারাজের আমন্ত্রণে দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় বর্ধমানে এসেছিলেন এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের ষাঁড়খানা গলিতে নবাবদোস্ত কায়েম লেনে বিরাট আকারে '' ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল'' প্রতিষ্ঠা করেন।পরে এই স্কুলটিই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিসপ্যাল স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। নবজাগরণের অন্যতম অঙ্গ যে, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, বর্ধমান তাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বর্ধমানের রাজপরিবারও বিশেষভাবে আংশগ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ তেজেন্দ্র এবং মহাতাবচাঁদ শিক্ষাবিস্তারে বিশেষভাবে ভূমিকা নিয়েছিলেন। তেজচন্দ্রের চেষ্টায় ভারতপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে) এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকুলার স্কু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়টি বর্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুল নামে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। পরে মহাতাব তাঁদের চেষ্টাতে রাজকলেজিয়েট স্কুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। মহাতাব চাঁদ বর্ধমানে ও অম্বিলা কালনায় কলিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তদানীন্তন সময়ে বর্ধমানে স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনেসপেক্টর ছিলেন কালিদাস মৈত্র এবং নবজাগরণের যুগের অন্যতম মনীষী হিন্দুকলেজের ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় কালিদাস মৈত্রের তত্ত্বাবধানে ৩৫ টি স্কুল ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ৪০ টি স্কুল ছিল। তখন সমগ্র বর্ধমান জেলায় ১৯০ টি টোল (Sanskrit School) এবং ১০১ টি মাদ্রাসা ছিল (Persian & Arabic School)। সে সময় ইসলামী শাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে মেমারী থানার বোহার গ্রামের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়াও বেশ কতকগুলি নৈশ বিদ্যালয় বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে ছিল এবং শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় (Guru Training School) বর্ধমানের লাকুর্ডিতে স্থাপিত হয়েছিল। এই স্কুলে বাংলা সাহিত্যের হিহাস রচয়িতা পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান পন্ডিত হয়েছিলেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। এছাড়াও বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য মহাতাবচাঁদ অনেকগুলি নৈশ বিদ্যালয়, আর্ট স্কুল ও ব্যায়ামের আখড়া স্থোন করেছিলেন। সে সময় বর্ধমানে একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চিন্তা মিশনারীদের অন্যতম একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চিন্তা মিশনারীদের অন্যতম অবদান বলা যায়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মিস্টারজেমস নামে জনৈক মিশনারী বর্ধমানে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা মহাতাব চাঁদ তখন এই পাঠাগারের উন্নতির জন্য এককালীন দুহাজার টাকা দান করেন। এর তিন বৎসর পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাতাবচাঁদ গোলাপবাগে ''দারুল বাহার'' নামক রাজপ্রাসাদে একটি সুন্দরপাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাতাবচাঁদের মৃত্যুর পর আফতাব চাঁদ রাজত্ব পেয়ে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান শহরের মধ্যস্থলে ''রাজ পাবলিক লাইব্রেরী'' নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা লরেন। ঐ পাঠাগারটির জন্য তিনি তখন এককালীন নহাজার টাকা দান করেন। ঐ পাঠাগার সেই সময় সারা বাংলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার ছিল।

বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাণপুরুষ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন শিক্ষাসংস্কারক, সাহিত্যিক, গদ্যের স্রষ্টা, বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী। বর্ধমানের সন্তান না হলেও বর্ধমানের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক হোয়ার পর কয়েকবার ই বর্ধমানে এসেছিলেন। তখন বর্ধমানে পার্কাস রোডের একটি বাড়ীতে এসে থাকতেন। বর্ধমান জেলায় তিনি পাঁচটি মডেল স্কুল ও ১১ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্ধমানের সন্নিকটে রসুলপুরেও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। রসুলপুরে তিনি তাঁর বন্ধু উমেশ চন্দ্র তর্কালংকারের বাড়ীতেও যেতেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ ই ডিসেম্বর উত্তরপাড়ায় বিদ্যাসাগর একবার গাড়ীদুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। সুস্থ হওয়ার পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত তিনি কিছুকাল তাঁর বন্ধু প্যারিচাঁদ মিত্রের বর্ধমানের বাড়িতে এসে ছিলেন। তখন প্যারিচাঁদ মিত্র বর্ধমানের জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া জ্বর মহামারী আকার ধারণ করলে মানবদরদী বিদ্যাসাগর ছোটলাট গ্রে সাহেবের কাছে জানিয়েছিলেন এবং নিজে বর্ধমানে ডিসপেনসারী খুলে রোগীদের ঔষধ পথ্য ও অর্থ সাহায্য করতেন। প্রায় দুহাজার টাকার কাপড়জামাও তিনি দান করেছিলেন। বর্ধমানে বসেই তিনি তাঁর '' ভ্রান্তিবিলাস'' নামক কৌতুকরসাশ্রিত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদ বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। ফলে আন্দোলন অনেকটা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছিল। বিদ্যাসাগর মহাতাবচাঁদকে ''The First Man of Bengal''আখ্যা দিয়েছিলেন। মহাতাবচাঁদ নব্য বঙ্গীয়দের মতই উদার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। বর্ধমানে রাজপরিবারে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাসত্ত্বেও মহাতাবচাঁদ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছিলেন।

এই সময়ে নবযুগের প্রথম সার্থক উপন্যাসিক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বর্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিদ্যাসাগরের বাসায় আসতেন। এই সকল মনীষীদের সমাগনে বর্ধমান অবশ্যই নবজাগতিক প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছিল।

নবজাগরণের যুগে বাংলা সাহিত্যের যে বহুমুখী বিকাশ ঘটেছিল, বর্ধমানের ভূমিকা সেখানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়। তিনি রাজা রামমোহনের সঙ্গে একত্রে '' সম্বাদকৌমুদী'' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভবানীচরণ জন্মগ্রহণ করেন উখরার নিকটবর্তী নারায়নপুর গ্রামে। তাঁর রচিত ''কলিকাতা কমলালয়'', ''নববাবু বিলাস'', ''নববিলাস'' প্রভৃতি ব্যাঙ্গাত্মক রচনাগুলি সে সময়ে বিশেষভাবে নব্য বঙ্গীয় সমাজে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি বিদ্যাসাগরেরও পূর্বে যেমন সহজভাষায় ব্যাঙ্গাত্মক রচনার পথিকৃৎ ছিলেন, তেমনি উপন্যাস রচনার পথ প্রদর্শকও ছিলেন বলা যায়।

হতিহাসাশ্রিত রোমান্স রচনার পথিকৃৎ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার আঝাপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক ও ঔপন্যাসিক।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কনিটির সদস্য মনোনীত হন। পরের বছর লক্ষ্নৌ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। রমেশচন্দ্র রচিত ''মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'' প্রকাশিত হল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে বৈদেশিক শাসকের উচ্ছেদকে বড় করে দেখানো হয়েছে। ''রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'' উপন্যাসের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বিশেষভাবে প্রকাশিত। তিনি বিভিন্ন লেখার মাধ্যমেই জাতীয় আন্দোলনকে নানা ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

নবজাগরণের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার অন্যতম কৃতিপুরুষ হলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। তাঁর জন্মস্থান (মাতুলালয়ে) মেমারীর নিকটবর্তী ইলসরা গ্রামে। (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ শে ডিসেম্বর)। পিত্রালয় দক্ষিণ দামোদরের বেড়ুগ্রামে। তৎকালীন বিখ্যাত সংবাদ পত্র ''বঙ্গবাসী'' পত্রিকা পরিচালনাকালে রাজনীতিতে তিনি বৃটিশ বিরোধী রচনার জন্য খ্যাতিমান হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাবিবাহে সম্মতিদান বিলের প্রতিবাদে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হল- শ্রী শ্রী রাজলক্ষী, মডেল ভগিনী, চিনিবাসচরিতামৃত, নেড়া হরিদাস, কালাচাঁদ, বাঙালী চরিত প্রভৃতি।

তিনি নহিন্দি ''বঙ্গবাসী'' ইংরাজী ''টেলিগ্রাফ'' প্রত্রিকার প্রতিষ্ঠা। বাংলার প্রাচিন সাহিত্য, বঙ্গানুবাদ সহ বহু শ্রাস্ত্র গ্রন্থ এবং বহুমূল্য লুপ্তপ্রায় বহু দুর্লভ ইংরাজী গ্রন্থের পুনরমুদ্রণ ও সংস্করণ করে তিনি শিক্ষানুরাগী মহলে চির অমর হয়ে আছেন।

এই যুগের নবজাগরণের ক্ষেত্রে অন্যতম খ্যাতিমান ব্যক্তি হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। তিনি পঞ্চানন্দ বা পাঁচুঠাকুর ছদ্মনামে ব্যাঙ্কগাত্মক লেখক হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার পাণ্ডউগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাটোয়ার নিকটে গঙ্গাকুটিকুরিতে বাস করতেন। ১৮৭৮ সালে তাঁর ব্যাঙ্গ উপন্যাস ''কল্পতরু'' প্রকাশিত হয়। সে যুগে ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলিষ্ঠ হাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের চাবুক ব্যবহার করেছিলেন।

নবজাগরণের যুগের প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আখ্যায়িকা কাব্য রচয়িতা হলেন রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়। রঙ্গলালের পৈতৃক নিবাস কালনার নিকটবর্তী রামেশ্বরপুর গ্রামে। কিন্তু তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া (তাঁর মাতুলালয়) গ্রামে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিহাস আশ্রিত রোমাণ্টিক আখ্যায়িকা কাব্য ''পদ্মিনী উপাখ্যান'' রচনা করেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাব্যটি রচনা করে তিনি একদিকে যেমন বাংলাকাব্যে নূতন যুগের দ্বার খুলে দিলান তেমনি মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করে দিলেন। তাঁর রচিত '' স্বাধীনতা হীনতায় / কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় / দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায়'' - এতেই উপ্ত হোল স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ।

হিন্দু প্রেট্রিয়টের সম্পাদক, প্রকাশক ও মালিক তরুণ বাঙালী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম ও নবজাগরণের যুগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলার মেমারী থানার অধীনস্থ শ্রীধরপুর গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। নিজ পারদর্শিতার গুণে মিলিটারী আফিসে

এ্যসিস্ট্যান্ট অডিটর পদে চাকরী করা কালীন তিনি রাজনীতি, আইন ও ইতিহাস সম্বন্ধে পড়াশুনা করে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর প্রকাশনায় হিন্দু পেট্রিয়ট ইংলন্ডেও শিক্ষিত মহলে আলোড়ন এনেছিল। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কুছু প্রকাশক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, নীলকর সাহেবদের ব্যবসা এখান থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেন বৃটিশ সরকার। তাই বলা হয়- হরিশ মুখোপাধ্যায়ের লেখার জোরেই বন্ধ হল নিলকর বাঁদরদের অত্যাচার।

ঊনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামি বিবেকানন্দ জন্মসূত্রে বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর পেতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী দত্ত ডেরোটন গ্রামে।

তাই পরিশেষে বলা যায় - ধর্মীয় আন্দোলনে, সমাজ সংস্কারে, শিক্ষার প্রসারে এবং নবযুগের ভাবধারাবাহী সাহিত্য সৃষ্টিতে, স্বদেশপ্রেমের জাগরণে, নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন রাঢ়বঙ্গের মধ্যমনি বর্ধমানে যথেষ্ট পরিমানে অনুভূত হয়েছিল। এই প্রাণস্পন্দন বাংলার নবজাগরণকেও যথেষ্ট প্রানবন্ত করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তথ্যসহায়ক গ্রন্থাবলী:-

ক) বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি- যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী
খ) রাঢ়বাংলার সংস্কৃতির ধারা - নীরদবরণ সরকার
গ) রত্নগর্ভী রাঢ় বর্ধমানের রত্নভাণ্ডার - নীরদবরণ সরকার
ঘ) বর্ধিষ্ণু বর্ধমান: - ডঃ হংশনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
ঙ) বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ণ ইতিবৃত্ত - শ্রী অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়
চ) বর্ধমান পরিক্রমা: - সুধীর চন্দ্র দাঁ